
তামিম মাহমুদ সিদ্দিক
ধ্রুপদী শ্রাবণ
প্রকাশক
বাংলার ই-বই
www.banglar-eboi.com

ধ্রুপদী শ্রাবণ

তামিম মাহমুদ সিদ্দিক



জন্মঃ ১৫ অক্টোবর ১৯৮১

কোলা, আত্রাই, নওগাঁ,

মুঠোফোন- ০১৭২১৭৯৬৯৯২

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থঃ হরিপদর প্রলাপ (২০১২)

কথা দিয়েছিলে
একদিন গান্ধারের রাতে দ্রৌপদি হবে
হওনি কখনো

উ ৎ স র্গ

দ্রৌপদি, মহাভারতের যে চরিত্রটি
আমার শরীরের ভেতরে অবলীলায়
শিহরণ তোলে। আমি সহজেই
অর্জুনের রাজ্যে প্রবেশ করে
সংবিধিবদ্ধ প্রতীক্ষায়
নীলচন্দন
জ্বালিয়ে
রাখি



ধ্রুপদী শ্রাবণ
কবিতার ই-বুক

গ্রন্থস্বত্ব
তামিম মাহমুদ সিদ্দিক

ই-বুক প্রকাশকাল
মার্চ, ২০১৩
ফাল্গুন, ১৪১৯

প্রচ্ছদ
আজম মাহমুদ

ই-বুক নির্মাণ ও
সার্বিক যোগাযোগ
সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী
ই-মেইলঃ rayhan_66@hotmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৮১৭৬১৭৭৬৪
ও
আজম মাহমুদ
ই-মেইলঃ ajombd@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭১৫৫৫১৮১৬

বাংলার ই-বই
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.banglar-eboi.com



ধ্রুপদী বিন্যাস

পানকৌড়ি/৬
শ্রাবণ বারবার/৭
তুলনা/৮
তুমুল প্রেমের গান/৯
এমন নিশিথ আগে এসেছিলো কবে!/১০
ফেরারি/১১
শোন মেয়ে/১২
পাখি হয়ে বাঁচি/১৩
গাঁয়ের ধারে পদ্মপুকুর/১৪
নরকের কোমল দহন/১৫
স্নিগ্ধসন্ধ্যায় চাঁদ/১৬
চিঠি/১৭
তৃষ্ণা/১৮
চিরকুট /১৯
অন্ধকারযাপন/২০
অভিষেক/২১
ভয় নেই মানুষ/২২
মাতাল/২৪
দেখা না হলেই ভালো হতো/২৫
সাঁওতালি প্রেম/২৬
হারানোর কিছু নেই/২৭
হিরন্ময়ী/২৮
তবু প্রেম আছে/২৯
প্রত্যয়/৩০
স্বপ্নচারী/৩১
বিস্মৃতি/৩২
কৃষ্ণামনির কথা/৩৩
একদা একটি হাঁস.../৩৪
অন্ত্যমিল/৩৫
পরিচিতিঃ অপরিচিতা/৩৬
দূর্ভেদ্য/৩৭



পানকৌড়ি

এ্যাতো কালো গভীর চোখে ডুব দিলো কে–
নগ্নবক্ষ জলের শরীরে, পানকৌড়ি?
আমি পানকৌড়ি হবো।

স্ফিতদোর নদীর চোখে শিকারির মতো ঢেউ
কখন যে বিঁধেছিলো এসে, নীল হয়ে গ্যাছে বুক!
খানিকটা জমে আছে পানকৌড়ি ঠোঁটে!

গভীর রাত্তির এলে একটু একটু করে শুষে নেবে
বালিকার আয়ু–
ভেসে যাবে শিকারির ঢেউয়ে...
ওই কালো গহীন চোখে এ্যাতো প্রেম!

আমি পানকৌড়ি হবো!
আমি পানকৌড়ি হবো!!

শ্রাবণ বারবার

হঠাৎ গাঙের ঢেউয়ে ছলাৎ ছলাৎ ...
কারা যেনো এসে ঘুরে গ্যাছে দীর্ঘদিন
বালিকার কাদা মাখা ফ্রক —— এখানে জলের চুমু
টিপ টিপ অবিরাম।
ঈশ্বর আজও বুঝি অনুশোচনার জলে ভিজে
কতোকাল নগ্ন বরষায়!

যখন নিবিড় ঘুমে, নিমগ্ন নিশিথে সারারাত ডুবে থাকি
গণিকার জলে ——
রুদ্রগ্রীষ্মের ঘামে বারবার শ্রাবণ আসে।

তুলনা

গতকাল সে এসেছিলো —
আজ অন্যজন
আমি দুজনের স্তনেই নির্লিপ্ত চুম্বন মেখেছি।
নিটোল বুকের শিল্পিত ভাঁজে অসংখ্য কবিতা;
কবিতারা স্বপ্ন দ্যাখে —
ফেরি করে ষোড়শীর প্রেম।
দীর্ঘযুগ প্রতীক্ষার পর সেই প্রেমে মুখ রেখে
আমি জীবন্ত হয়েছি...

একজোড়া মুখ
সুটোল স্তনের খেলা
এক চোখে জল —
অন্য চোখে কামনার জ্বালা।

তুমুল প্রেমের গান

তুমি আবার আইসো কইন্যা তটিনীর তীরে —
লোনা জল ড্যাবড্যাবে চোখের ভেতরে
কইন্যা আইসো ঘরে...

পিঁড়িটি বিছায়ে দেবো চাঁদনী রাতে —
গোপনে মাদুলি হবো নিটোল হাতে
শরম পাইওনা কইন্যা লোকে যদি দ্যাখে
পিরিতি নদীর ঘাটে বাঁধা সারে সারে।
কইন্যা আইসো ঘরে...

এখানে গাঙের ঢেউয়ে ছলছল পুরাতন খেলা —
এসে যদি ফিরে যাও তাই বসে থাকি সারাবেলা
ধূসর রঙিন চোখে স্বপ্নের মেলা।

কইন্যা তোমার বাড়ি যেতে বলো কতো দূর —
সেখানে কদম ফোটে, শেফালিকা ঝরে ঝুর ঝুর?
উচাটন মন নিয়ে আবার আইসো চুপিসারে।
কইন্যা আইসো ঘরে...

এমন নিশিথ আগে এসেছিলো কবে!

একদিন সারারাত বৃষ্টি হবে
সাঁঝের শঙ্খ থেকে শব্দরা ছুটে যাবে কালের ওপারে।
নক্ষত্রের মলিন আলোয় সুস্মিতা চাঁদ
সুখ জাগানিয়া —
নন্দনের ভেজা ঘাসে শিরীষের মতো প্রেম
কিশোরী চাঁদের বুকে তিতির বালিকা
কতোরাত লিখে যাবো শান্ত জলের বুকে জোয়ারের খেলা —

সকলেই জানে, তুমিও জেনেছো
জোয়ারের বুকে ঝুঁকে থাকা চাঁদ কেবলই সমুদ্র টানে।
(এমন নিশিথ আগে এসেছিলো কবে!)

ফেরারি

কোন ধ্রুপদী প্রেম তোমার গোপন বিরহে যদি
রাত হয়ে ডাকে?
ভীষণ শীৎকারে যদি আর কখনোই সকাল না হয়?

মৃত নক্ষত্রের গাছে কিছু গোলাপ ছিলো —
প্রেমও ছিলো কলুষিত চাঁদের পালকে।

ওই শীতল নির্জন চোখে তুমি সব নিয়েছো মেখে?

তবে আমি কি শুধুই ফেরারী?



শোন মেয়ে

তোমার গহীন জলে যদি একবার ডুব দেয়া যেতো!

তুমি ধানসিঁড়ি হও
হও কীর্তনখোলার বাঁক —
প্রবল বর্ষণ হও লবন শরীরে!

তুমি যদি হতে পারো ঝিনুক, প্রবাল আর কামিনী সুবাস
রাত এলে সব দেবো; শোন মেয়ে উদাসী আকাশ।

পাখি হয়ে বাঁচি

আমার জানালার গ্রীলে রোজ একটি পাখি এসে বসে।
নিঃসঙ্গ, আব্রত পালকে —
জন্মাবধি এক নতুন বিস্ময়ে প্রাচীন পত্রপূট —
পান করে নিরলস প্রমিত উচ্চারণে অনবদ্য সপ্তমীর গান।

আজ-কাল দৃশ্যের চোখে উচ্চাঙ্গ ক্যামেরা রেখে
রাত কাটে ঈশ্বরের।
মাটি তাকে দিয়ে গেছে যতো টুকু ধূপ
(সেটাই আরাধ্য ছিলো)
নির্বিঘ্নে-গন্ধে ভিজে একদিন রবু শেঠ-ই চেয়ে ছিলো পাখি হতে
নিঃসঙ্গ জানালার গ্রীলে।
তার সাথে কথা বলে অনায়াসে জেনে গেছি —
বিষন্ন পালকের সজ্জিত প্রাণে অফুরন্ত বেদনার নীল।

পাখি উড়ে গেলে পর
পাথুরে শহর ছেড়ে গোপন প্রতীমার স্তনে
নিটোল ভাঁজের মতো —
আমিও চুপি চুপি পাখি হয়ে বাঁচি।

গাঁয়ের ধারে পদ্মপুকুর

গাঁয়ের ধারে পদ্মপুকুর রে ...
ওই না জলে ডুইবা মরে আমার ময়না পাখি
শ্যামল জলের বাসনাতে মন ক্যামনে বাইন্ধা রাখি
পাখির কাজল কালো আঁখি।

রাত-বিরাতে মাঠের বাঁশি কান্দিয়া মরে
জলেরও ভেতরে কইন্যা সুখের বসত করে
তোমারে বলি ও চাঁদ নয়নেরো নীরে
জোছনা বিলাইয়ো তুমি ভিজাইয়া আঁখি।

যতনও করিয়া পাখি বাইন্ধা ছিলো সুর
যে সুরে শাওনও মেঘে যাইতো বহুদূর
সাত-সাগরের পাড়ে পাখির এখন বসবাস
গাঙের ঢেউয়ে উথাল-পাথাল বুকে হা-হুতাশ

নদীরও কিনারে ভাঙা গাছেরও ফাঁকে
পাখির ফেলে যাওয়া রাখি।

নরকের কোমল দহন

ছেলেবেলায় বাবার হাত ধরে মসজিদে যেতাম। সারিবদ্ধ মানুষগুলো ভীষণ ভক্তিপ্রিয়। ওরা ঈশ্বর চায়। ইমামের দূর্বোধ্য খুৎবা তখন দারুন ভাবাতো! বাবা বলতেন, মন দিয়ে শোন- নিশ্চয় স্বর্গে যাবে একদিন।

এরকম স্বর্গের খোঁজ আমি আগেও পেয়েছি। ফেরদৌসের উপভোগ্য রমণীরা শুনেছি অথই সাগর। যে কেউ ডুবতে পারে ডুবাতে পারে এরকম গেলমানে ভরা পবিত্র নগরী। মৈথুন শেষে সেখানে অবসাদ নেই। রমণীর অসার শরীর কস্তুরী গন্ধে ভরা। মদ এবং নারী পবিত্রতার শুদ্ধ প্রতীক। হিংস্রতা নেই- মৌলভির টুপির ভেতরে সাপ থাকেনা। পুরোহিতের পৈতা-য় থাকেনা দগদগে ঘা। সেখানে ভদ্রলোক আছেন, আদম ব্যবসায়ী; থুথুরে নিরীহ বৃদ্ধ থেকে ওগাঁয়ের তাগড়া জোয়ান।

শুনেছি, পৃথিবীতে যাদের ধর্মান্ধ-কপট বলে গালি দিতেন কবি শামসুর রাহমান- তারাও সেখানে তাস-পাশা খ্যালে। তাদেরও আঙুলে নাচে সিনথেটিক হুর।

আমার গা ঘিনঘিন করে, মগজে আদিম ক্রোধ। আমাকেও যেতে হবে এমন বিভৎস নগরীর পেটে? যেখানে প্রতিহিংসা নেই অথবা কষ্টের পরে অনাবিল সুখ; কোনকিছু পেয়ে হারানোর মধুর বেদনা নেই অথবা ট্রেনে কাটা লাশ দেখে স্বজনের আহাজারি!

এমন মমতাহীন স্বর্গের স্রোতে আমি কিভাবে ভাসবো পিতা!

যারা চায়, যাক তারা- তারা তো যাবেই। আমি না হয় থেকে যাবো নরকের কোমল দহনে।

স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় চাঁদ

কতোদিন আগের কথা!
সেই চাঁদ, বৃদ্ধ পৃথিবীর সমান বয়েসী
একটা আঁশটে গন্ধের মতো সারারাত জেগে ছিলো —
প্রাচীন পুরাণ থেকে দূর্বোধ্য শব্দের গায়ে;
অপ্রার্থিত বৃষ্টির মতো একটা সময় ছিলো
নদীর ঢেউয়ে —
ভীষণ বন্যায়।

বহুদিন আগের কথা!
রঙধনু, বুড়ো ঈশ্বরের সমান বয়েসী
একটা বিরল ছন্দের মতো সারাদিন মেখে ছিলো —
রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে বাউল গানের রাগে;
কিশোরীর প্রেমের মতো একটা বিকেল ছিলো
রঙিন বাগানে —
দোলনচাঁপায়।

এখন রাত- দিন, রঙধনু, চাঁদ নিঃসঙ্গ বটের গায়ে লেগে থাকা
ভাস্কর্যের মতো বহুদিন ডেকে ডেকে ফিরে গেছে।

বিষ্যুৎবার রাতের কথা, তোর মনে আছে?
স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় চাঁদ নেমে এসেছিলো জলে!

চিঠি

ধ্রুপদী,
কিছু কিছু প্রেম আছে, যেখানে প্রত্যাশা স্বপ্নাতীত —
তুমুল আকর্ষণ ক্রমশ বেদনাহত করে। চোখ শুধু স্বপ্নই দ্যাখেনা, ভীষণ ভাবে বলতে থাকে —
ভালোবাসি, ভালোবাসি...

এই কোমল বেদনা মানুষকে আসক্ত করে —
একটা মধুর ঝুনঝুনি বাজায়। এই মাদকতা আমাকে ভীষণ পেয়ে বসেছে।

এ্যাতো দিন জানতাম, বেদনা কেবলই কটু স্বাদময় তুমুল তীব্র বিষ। আসলে তা নয়।

এই মধুর বেদনা যুগ যুগ ধরে প্রত্যাশিত হোক —

তৃষ্ণা

ঘুম থেকে জেগে এক অবাধ্য ঠোঁটের তৃষ্ণা
তোমাকে ব্যাকুল করবে।

ঘামের নোনতা স্বাদে যতোখানি মাদকতা আছে
আজকাল বার্মিজ মদেও সেটা নেই।
অবিরাম ঘামতে থাকি এই ভেবে —
ঘামতে ঘামতে বিভোর মাতাল হলে অন্ধকারে শিখারা জ্বলে ওঠে
শীতে পাওয়া ঠোঁটের মতো।

ঘুম থেকে জেগে এক লবণ বর্ষণে তুমি মাতাল হবে।
অনবদ্য রাত্রিগাঁথা লিখা হবে —
ঠোঁটের তিয়াসে

চিরকুট

আমার জন্মের সময় ঈশ্বরের জন্ম হয়েছিলো —
সে কথা বলেছে চিঠি
পুরনো চিরকুট

প্রাচীন পঞ্জিকার গায়ে অবাধ্য অক্ষরের মতো লেপ্টে থাকা খাম,
প্রপিতামহের ভোঁতা তরোবারি —
ক্রমান্বয়ে ইতিহাস।
তারও আগে যীশুদা-র ক্রুশ, তীক্ষ্ণফলক, পাথর —
অথবা মুহাম্মদের হিজরি বসন;
আরাধ্য হেরাম্বিত রাত, অন্ধকার
মুর্ছিত ঈশ্বরের চেয়েও অধিক প্রাচীন।
আদিম দেবতাদের ঘ্রাণে স্বয়ংক্রিয় স্বরে
অনাদি নিঃসীম।

সে কথা বলেছে চিঠি
পুরনো চিরকুট।

অন্ধকারযাপন

তোমাদের পাড়ার অন্ধকারগুলো জাফরান রঙের মতো —
গড়াতে গড়াতে নিখুঁত চিত্রকল্প হয়ে যায়।
রাত্রিযাপন শেষে মূর্তমান সত্তা যেমন হঠাৎ
বিমূর্ত হয়, কল্পনার ঘ্রাণে সেই রকম
অন্ধকার এলে —
নীরবতাও কথা বলে নিঃসীম নীলের চোখে,
কালো চোখে —
সর্পিনী শরীরপাড়ায়।

কীরকম শৃঙ্গারে ভেসে অন্ধকারও কথা বলে
সহোদরা মৃত্যুর সাথে —
যেমন নীলিমার সাথে নির্লিপ্ত প্রবাল।

অভিষেক

গন্দম-বিষে আমার আসক্তি ছিলো —
স্বর্গচ্যুতির আগেই ঈশ্বর জানিয়েছিলেন সত্যটা।
ভীষণ দুর্বিপাকে আতঙ্কিত স্বর্গবাসীর চোখে
সেদিন কী যে বিস্ময়!

ঈশ্বরের তৈলাক্ত তরুনাস্থি হাতে সেই থেকে ঝুঁকে আছি
অবনিপ্রশান্ত সবুজের বুকে।

সেখানে প্রথম আমি —
অভিসপ্ত ধরনীর একমাত্র অভিষিক্ত প্রাণ।

ভয় নেই মানুষ

বিস্তৃত মাঠ। মাঠের কান্না। রুপালী চাদরে মোড়া নরম বেদনার বেহিসেবি যাতায়াত। চারিদিকে সুনীল প্রাচীর। কোমল বাতাসে গাঁজার ধোঁয়াগুলি চাঁদছুঁই খেলায় তুমুল ব্যস্ত। কেউ কেউ বিষম নেশায় বুঁদ হয়ে বসে আছে। আমি ক্রমশ পায়চারি করছি সেই মাতাল মানব-বৃত্তের পরিধি ধরে। আকাশে বিরাট চাঁদ মুচকি হাসে; তারাগুলি চোখ টিপে ধরে। ঈশাণের হলুদ মেঘে চাবুকের মতো বিজলী ঠেসে আছে। আমি বদলে যেতে থাকি। নিজেকে উলঙ্গ করে ধরি স্বয়ম্বরা প্রকৃতির চোখে।

প্রবীর দা গীটার নিয়ে অনেক্ষণ টুংটাং বাজিয়ে যাচ্ছে- হীরণ গাঁজা ভরছে- এবং বিজলীর দ্বৈত লীলায় আমি ক্রমশ কবিতা হয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ ইচ্ছে করল- আজম খানের অনামিকা যদি শুনতাম! প্রবীর দা-র গীটার প্রসারিত হলো সুগন্ধি মহুয়ায়। 'চুপ চুপ চুপ অনামিকা চুপ, কথা বোলো না...'। গান শুনতে শুনতে আকাশের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হচ্ছি। বিজলী প্রসারিত হলে একটা বিকট শব্দ হলো। ইচ্ছে করছিলো ওই ভাসমান চাঁদটি যদি আমার হতো! বলা নেই কওয়া নেই, সেই চাঁদ ঠিক নেমে এলো আমার হাতে। তুমুল উত্তেজনায় চারিদিকে উজ্জ্বল। কিশোরীর শীৎকার শুনি। শান্ত চাঁদের বুকে এ্যাতো কামনা! অন্যপাশে দগদগে ঘা। বেঁচে থাকার করুণ আকুতি।

বন্ধুরা ভাবছে, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। আমিও তাই বলি- পাগল! তবে সেই ভালো, এ আমার অহঙ্কার।

গাঁজার ধোঁয়াগুলো ওপাশ থেকে ঘুরে এসে এমন সব তথ্য দিলে, আমরা হতবাক! ঠাঁয় বসে আছে মৃদুল। চোখে তার রাজ্যের ক্ষুধা।

আজ রাতে ঈশ্বর আসবেন। দীর্ঘ দিন জমা করা আমার অনেকগুলো প্রশ্ন ছিলো। ধোঁয়া, তোমাকে ধন্যবাদ- এই নাও চকোলেট, ছেলেদের খেতে দিও।

ঈশ্বর আসবেন- সপ্তডিঙ্গা, বোরাক নাকি বাতাসের আরকে? গাঁজার নেশা রক্তিম হতে থাকে। চোখদুটি জবা ফুলের মতো লাল।

প্রায় ভোর হতে হতে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেলো। প্রবীর দা কাঁদতে লাগলো, মৃদুল নেংটো হয়ে নাচছে, মুরাদ ইলেকট্রিক পোল ধরে আকাশে ওঠার চেষ্টা করছে। আমি ভাবছি ঈশ্বরের কথা। তিনি দেখতে কেমন, পরনে কী থাকবে? মাথায় টুপি নাকি চন্দনের টীকা? গায়ে জোব্বা, পাঞ্জাবী নাকি পৈতা পরিহিত কোন শুদ্ধ ব্রাহ্মণ?

একটা সময় সবাই চলে গেলো। আমি ধীরে ধীরে ফাঁকা রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরছি। বউ অপেক্ষা করছে নির্ঘুম। লক্ষ্য করলাম, দ্রুতগামী একটা ট্রাক আমার দিকে তুমুল ধেয়ে আসছে। আমি চোখ বন্ধ করে আছি। একটুও নড়তে পারছি না।

আজ ঈশ্বর আসার কথা ছিলো। এলো না। আমার অনেকগুলো প্রশ্ন ছিলো। লাল, নীল, ট্রাকের শব্দের মতো ঝনঝনে সব প্রশ্ন। কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই সাঁই করে ছিটকে পড়লাম। মাথার মধ্যে ঈশ্বর। হাত-পা ঝেড়ে উঠে দেখলাম- ট্রাক চলে গেছে; নিশ্চুপ শুয়ে আছে লন্ডভন্ড- বেঁচে থাকার কী করুণ আকুতি- বৃদ্ধ বেওয়ারিশ কুকুরটি! অনেকদিন ধরে যে আমাকে নিভৃতে পাহারা দিয়ে আসছে। পৃথিবীর সবচেয়ে স্বার্থপর প্রাণিটির অবলীলায় আত্মহনন। মগজ ছিটকে গেছে, দ্বিখন্ডিত পাঁজরে ফুসফুসের শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা। চারিদিকে অন্ধকার, মরা মানুষের গন্ধ। লাশ পড়ে আছে রাস্তার মধ্যেখানে। ছিন্ন-ভিন্ন চোখে নিঃষ্পলক আমাকে দ্যাখে।

শরীরের সমস্ত যন্ত্রণা ঝেড়ে আমি তখন চিৎকার দিয়ে উঠি- ঈশ্বর আজ কথা রেখেছে, তোমাদের ভয় নেই মানুষ। ওই দ্যাখো ঈশ্বর কী দারুণ জেগে থাকে তোমাদের পাশে।

মাতাল

কাগজ দিয়েছো ছিঁড়ে
কতোকাল পরে জোড়াতালি দেয়া পঙ্‌ক্তিগুলো
কী নিপুণ ভাবে গর্জে উঠেছে দ্যাখো,
বদমেজাজি কোনো এক কবির কণ্ঠনালী ছিঁড়ে!

আমার বিস্ময় হয় —
আকণ্ঠ মদ্যপানে অপ্রকৃতস্থ ওই কাগজখানি আজ
কেনো জানি —
বড় বেশি মাতাল হতে চায়।

দেখা না হলেই ভালো হতো

দেখা না হলেই ভালো হতো
চন্দ্রিমা রথে
এই মেঠো পথে
স্বপ্ন ছড়ানো যেতো।

স্নিগ্ধ গোধূলি, হিরণ্যরেতা- চন্দ্রমোথিত রাতে
জোছনা খচিত বিমূর্ত প্রীতি শিল্পিত অভিঘাতে
বিলোল সমীরে
নীল সরোবরে
অশ্রু ঝরানো যেতো।

দেখা না হলেই ভালো হতো...

সাঁওতালি প্রেম

সাঁওতাল মেয়ের চোখে রাজ্যের প্রেম। সমস্ত যন্ত্রণার বিষণ্ন আধার হয়ে এ কেমন দিনাতিপাত! ইচ্ছে করে পানকৌড়ি হয়ে ডুবে থাকি সাঁওতাল চোখে- অনবদ্য সাগরে।

সাগরের সমস্ত লবণ ছেঁকে ইচ্ছে করে তুলে আনি প্রতীমার নির্যাস। তোমাকে সাধারণ মানুষ সাজাতে পারবেনা মেয়ে। তোমার চাই নক্ষত্রের চোখ। সেই চোখে যদি দ্যাখো তাকে, কখনো হারাবে না প্রেম।

শুধু প্রান্তর ফুঁড়ে ধেয়ে আসবে নরম বেদনারা। ভয় নেই, এ দারুণ কোমল। লাগবে না এতটুকু- কেবল ছুঁয়ে দেবে বুক।

হারানোর কিছু নেই

হারানোর কিছু নেই এই জেনে —
যখনই দিয়েছি পাড়ি- অলকার নন্দিনী জলে
ধু-ধু মাঠ উড়ে গেছে তুলোর মতোন
শিকারীর নিপুণ তালুতে।

হিরন্ময়ী

হিরন্ময় রাত্রির নির্যাসে উন্মোচন করো নারী
আরণ্যক প্রীতির শেকড়। অবোধ কষ্টের মতো
ঝরোকার প্রাণের প্রদীপে দীপ্যমান, প্রস্ফুটিত
জীবনের শুদ্ধ আলিঙ্গণ। আসন্ন স্বপনচারী
তুমি শুধু লীলা নও, ব্রাত্য সঙ্গীতের মতো ধীর —
বিষন্ন নদীর বুকে চিহ্নহীন নিস্তরঙ্গ খেলা
কবিতার অবোধ্য চরণ, বিস্তৃত সমুদবেলা —
ছান্দসিক নক্ষত্রের রাত নিরুপম প্রকৃতির।

দীপান্বিত রাত্রির কার্ণিশে উন্মোচন করো নারী
অশরীরী প্রেমের পরাগ। পুষ্পগাঁথা জলধির
ঢেউ- সে জলে গোলাপ ছিলো মহুয়ার কাদম্বরী
ঘ্রাণ। আজন্ম লালসাগাঁথা গোপন শ্মশানচারী
তোমার পরশে হলো প্রীত- সংক্ষুব্ধ ধরনীর
প্রেম, সে প্রেমে তুমিও নারী মোহময় বিভাবরী।

তবু প্রেম আছে

ছেঁড়াপালকের গায়ে খোদাই করা প্রেম
প্রেম আছে নদীর ওপারে, জেলেদের নায়ে।
বড়াল নদীর ধারে কাশবন, শারসের প্রিয় সংসারে
মাতাল ঝড়ের প্রেম...
প্রেম আছে শালিকের নীড়ে, বটের চাদরে।

বেশ্যাপাড়ায় রাতে প্রতিদিন পুলিশের প্রেম
প্রেম আছে গলির ভেতরে, গণিকার গাঁয়ে।
বাদুড়ের ঝুলে থাকা গাছের শাখায় প্রাগৈতিহাসিক প্রেম
ক্ষুধার্ত শিশুর পেটে ফেঁপে ওঠা কলেরার প্রেম
র‍্যাবের একটি গুলি —
হঠাৎ হারানো পায়ে লিমনের প্রেম।

প্রেম আছে আঁধারের চোখে, রাতের ছায়ায় —
রমনীর জমা করা সুখের ব্যথায়;

দীর্ঘদিন জমে থাকা কষ্টের বুকে তবু প্রেম আছে।

প্রত্যয়

অবশেষে সমুদয় চিহ্ন-সূত্র ছিঁড়ে নগরীর অপুষ্ট শরীর। পরাধীন কংক্রিটের মতো ধাতব কর্ষণে অনায়াসে জেনে গেছি- অনন্য বেদনাবিহার প্রাণিত উৎসের মুখে সঞ্চিত পরমায়ু এক, আমিই ঈশ্বর-

অনাঘ্রাতা কিশোরীর বুকে সবুজ প্রত্যয়।

স্বপ্নচারী

অভীপ্সু স্বপ্নবাজের অর্কেষ্ট্রা শুনি
জলমহালের জলে।

সঙ্গিন পটুয়া মেয়ে রাত্রির পটে রঙধনু আঁকে —
বেহালায় সুর তোলে ফেরারী তিথি —
নিমগ্ন জলের চোখে চৈতালী স্বপ্ন দ্যাখে
বানভাসি ফসলের মাঠ।

অশরীরী অন্ধকার চিরে কারা যেনো দীপ জ্বালে —
পিয়ানোয় সুর তোলে —
অবিরাম হেঁটে যায় বিশীর্ণ বন্ধুর পথে
স্বপ্নহীন কতো রাত।

বিস্মৃতি

ঘরে ফিরে প্রায়শ-ই চোখে পড়ে পিতার পাণ্ডুর
মুখ। ছন্দঋদ্ধ বুক সহসা হারিয়ে ফেলে সুর —
জননীর বাহুডোরে সঁপে দিয়ে রঙিন দুপুর
হারাই ভাটির গাঙে। নবমীর চাঁদের সিঁদুর
মেখে নিয়ে ললাটের বিন্দু বিন্দু আরক্তিম ঘামে
ডুবে থাকি গণিকার ঠোঁটের শিল্পের মতো জলে;
সঙ্কলিত প্রতিকৃতি পরাজিত স্থির অস্তাচলে
চেতনা আরষ্ট হলো বিবেকের রঙ করা খামে।

পিতার পাণ্ডুর মুখে জগতের ভীরু অয়োজনে
বিবিধ বর্ষণে কাঁপে অবনির শীতল শেকড়;
স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রণার মতো অবরুদ্ধ কষ্ট যতো
পিতার বিস্মিত চোখে। অন্ধকারে, মৃদু আস্ফালনে
দুঃখগুলো দীর্ঘশ্বাসে ডেকে তোলে অঙ্কুরিত ভোর-
চৈতালী হিমের ঝড়ে ক্রমান্বয়ে যেনো পরিণত।

কৃষ্ণামনির কথা

কৃষ্ণামনি টিলার ওপরে ছোট ছোট গুল্ম
এবরো থেবরো জারুল পলাশ
হঠাৎ মালঞ্চীর বনে ঘুটঘুটে অন্ধকার ——
সেখানে মৃদঙ্গ বাজে-সংস্কৃত শ্লোক;
সুর তোলে বাল্মীকি রাত।
স্ববিরোধি বালকেরা রোজ রাতে সেখানে যায়
স্বয়ংক্রিয় বালকেরা রোজ ভোরে সেখানে হারায়।

বহুদিন ভাবতে ভাবতে ঈশ্বরের চোখ অন্ধ হলে
মৃতবালকের আত্মাগুলো পুনরায় ঈশ্বর হয়

কৃষ্ণামনি টিলার ওপরে ছোট ছোট অন্ধকার
এবরো থেবরো শিমুল চাঁপা
আর রঙিন ফানুসে ওড়ে ——
ঐশ্বরিক অভিলাষ।

একদা একটি হাঁস . . .

মানুষও আজকাল সরীসৃপের মতো ডিম পাড়ে।
লাল, নীল, খয়েরী, ধূসর, বাদামী রঙের ডিম;
কবিদের ডিম পাড়া দেখে হাসতে হাসতে দম যায়!

'একদা একটি হাঁস মন্ত্রীর মতো ডিম পাড়িতো'- শিরোনামে
প্রবন্ধ লিখে বাঙলা আকাদেমি পেয়েছিলেন এক আমলা।
তারও আগে স্তন্যপায়ীরা চতুস্পদী ছিলো-
ধীরে ধীরে গিরগিটি হলে
জরায়ুতে এ্যালবুমিন জমে- নিষেকে গর্ভিনী হয়ে
সেই থেকে ডিম পাড়া শুরু...

গাজনের ঝাঁঝালো ডিমে সুদৃশ্য রশ্মি দেখে
প্রেসিডেন্ট একবার ডিম দিয়েছিলেন।

আহা! ইহা এক গণতান্ত্রিক ডিম!
আল্লা-ই জানে, ইহা কি মানুষে পাড়ে?

অন্ত্যমিল

তোমার অপ্সরা রোজ আসে অনিরুদ্ধ মরু ঝড়ে
চাঁদের প্রান্তর থেকে আলোকিত স্বপ্নের জঙ্গলে।
বিষাদের ঢেউ ভেঙে হৃদয়ের কতো কথা বলে
তোমার মতোই যেনো হেসে হেসে বিবর্ণ দুপুরে।

তোমার অপ্সরা রোজ আসে স্বপ্নের সমুদ্রতটে
তোমাদের কথা বলে। কেমন রয়েছো আজকাল
কেমন চুলের খোঁপা, কেমন চন্দনে মাখো গাল —
কেমন শিশির ছোঁয়া ছবি আঁকো হৃদয়ের পটে।

আজন্ম প্রাণের প্রেমে শোধ করে জীবনের দেনা —
যমুনার ঘোলা জলে সঁপে দিয়ে স্মৃতি অমলিন
ভুলে গ্যাছো সব, নাকি ফুলের সুগন্ধে অন্তরীণ
রেখে আসা কথকতা, অনির্ণীত অবোধ বেদনা?

তোমার অপ্সরা তবু আসে কবিতার দীপ জ্বেলে
জীবনের অন্ত্যমিল খোঁজে অন্তহীন অস্তাচলে।

পরিচিতিঃ অপরিচিতা

ভালো করে দ্যাখাই হলো না —
যাযাবর সময় এসে নিকানো অন্ধকারে বিছিয়ে দিয়েছে রাত।
রোদচশমার ভেতর থেকে রঙিন আয়না খসে গেলে
সাদা-কালো হয়ে উঠি —
রক্তের ভেতর থেকে নিখাদ তরল।

-পলাশের রঙ ধূসর হলে শিল্পির বদনাম হবে-
এই ভেবে গুটিয়ে নিয়েছো হাত —
সমর্পিত হাত।

প্রিয় নীল
নীল চন্দন রাত —
কী ভীষণ সাজিয়েছো নীলে!

এ কোন উৎসের স্রোতে ভেসে আসা বেদনা-সম্ভার?
ভালো করে জানাই গ্যালো না —
জানাশোনা, কোনো এক কালের ভেতরে কর্ষিত চাঁদ হয়ে আছে ...

দূর্ভেদ্য

শিঁকলে বেঁধেছো হাত?
ওই হাত আগুনে পোড়ে না-

আজন্ম অন্ধকারে লীন অনাদি-ক্লিষ্ট যেই হাত
পতাকার সবুজে স্নাত।

মেহেদি পাতার রঙে কতো আর লাল থাকে
যতোখানি কামারের ঘামে
রোদ্দুরে
অথবা নিষিদ্ধ গানে?

শিঁকলে বেঁধেছো গান?
ওই গান বিভেদ মানে না।